'বন হাথি'

'বন-কথা': ভাজ্জু শ্যামের প্রদর্শনী

লোকশিল্পের একটি গহন যাত্রাপথ আছে, ঐতিহ্য থেকে সমকালীনতার বলয়ে। ভাজ্জু শ্যামের ছবিতে তা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

চিত্রকলা

প্রদর্শনীর নাম 'বন-কথা'। তা শুধু বনের কথা নয়, মনের কথা, মননেরও কথা। গোন্ড লোকশিল্পী ভাজ্জু শ্যামের যে-প্রদর্শনী সম্প্রতি হয়ে গেল আকৃতি আর্ট গ্যালারিতে, সেখানে শুধু দৃশ্য নয়, বরং দৃশ্যাতীত একাধিক বোধের সঙ্গে দর্শকের একটা সহজ সংযোগ ঘটে। প্রকৃতি ও জীবের নিবিড় যোগে যে সপ্রাণ বলয় এই গ্রহকে বিশিষ্ট করেছে, এগিয়ে-চলা সভ্যতা তার প্রতি খানিকটা অনাদরই দেখিয়ে এসেছে বরাবর— অথচ প্রায় সব এলাকার, সব ধরনের লোকশিল্পেই এই সম্মিলনের একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এও লক্ষ করতে হয় যে, মূলধারার শিল্প-ইতিহাসে লোকশিল্পের উপস্থিতি বরাবরই প্রান্তিক। ফলে এই প্রদর্শনীতে প্রথমেই দুটো অভিনবত্ব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথমত, গ্যালারির স্পেসকে আধুনিক ও সমকালীন ভাবা আমাদের একধরনের অর্জিত নাগরিক অভ্যাস, ফলে সেই পরিসরে লোকশিল্প-আশ্রিত একটা পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী দেখানোর ব্যবস্থা করা প্রথমেই একটা চমক তৈরি করে। হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় যে, লোকশিল্পও প্রবহমান, তারও সমকালীনতার

প্রতি থাকে অপর দৃষ্টি, ফলে মূলধারার শিল্পের ক্ষেত্রে তার প্রান্তবর্তী অবস্থানকে প্রশ্ন করা চলে সহজেই।

দ্বিতীয় কারণটিও আমাদের ভাবনার ভঙ্গির সঙ্গে সংযুক্ত। সাম্প্রতিককালে গোটা পৃথিবী জুড়েই পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের মনোভাব বদলাচ্ছে। প্রকৃতি ও জীবের একত্র সহবাসের সহজ সূত্রটি আবার অধিগত না হলে সমূহ বিপদ, তা আমরা সকলেই মোটামুটি জানি। সভ্যতা-আশ্রিত মানুষ যে পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে মনোযোগী হয়েছে একেবারেই প্রয়োজনের সূত্রে, তা যেন একটু অস্বস্তিকরভাবেই প্রকট হয়ে যায় এইসব ছবির সহজ, স্বতঃসিদ্ধ পারস্পরিকতার কাহিনি দেখবার পর। মনে হয়, এই অস্বস্তিরও বোধহয় প্রয়োজন ছিল।

মধ্য ভারতের গোন্ডদের এক উপসম্প্রদায় 'পর্ধান' গোন্ড, তাদেরই কালানুক্রমিক শিল্প-ঐতিহ্যকে নিজের কাজের মধ্যে ধরে রেখেছেন ভাজ্জু শ্যাম। এই চিত্রচর্চা একসময় তাঁদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচারের প্রকরণগত অংশ ছিল, এবং এই বিষয়টা বহু লোকশিল্পের ক্ষেত্রেই দেখা যায়— ঠিক যেমন বাংলার ব্রতের আলপনা। ছবির মধ্য দিয়ে শুভকে জীবনে স্থাপন করা এবং অশুভকে বিতাড়িত করা— এই চিত্রভাবনার মধ্যে একটা স্পষ্ট মেটাফর রয়েছে। এই রূপক-লক্ষণকে অনেকটা প্রসারিত করে ব্যবহার করেছেন শিল্পী নিজের কাজে, ফলে সমকালের সঙ্গে তাঁর ছবির সংযোগসূত্রটি চোখ এড়ায় না। অথচ গোন্ড শিল্পের ঐতিহ্যগত রূপটিও তাঁর কাজে অটুট। যেমন, তাঁর বেশির ভাগ ছবিতেই একটা বৃক্ষের চেহারা পাই, তা সাধারণত কেন্দ্রীয় ও বৃহৎ, ক্যানভাসকে যেন সে অধিকার করে রাখে একাই। চারদিকে ছড়ানো ডালপালা ও পাতা নিয়ে এই যে সর্বত্রসঞ্চারী বৃক্ষ, গোন্ড সংস্কৃতিতে তার একটা প্রতীকী গুরুত্ব আছে; আকাশের পানে গাছের ঊর্ধ্বমুখ চলনটি তাঁদের কাছে এক ঈশ্বর-অভিমুখী যাত্রাপথ, এবং এইভাবেই তা মাটির জীবজগৎকে যুক্ত করে ঈশ্বরের সঙ্গে। অথচ ভাজ্জু শ্যামের ছবিতে গাছ শুধুমাত্র এই উন্মুখ যাত্রাপথটুকুই নয়, সে নিজেই একটা স্বাগত আশ্রয়— তার পাতার ফাঁকে বসে থাকে পাখি, ডালে ডালে ঘুরতে থাকে নানাপ্রকার পশু, এমনকি মানুষজনেরও আনাগোনা তার শিকড় ও কাণ্ডের আশেপাশে। আমরা যেন শুধু একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষকেই দেখি না, একটা গোটা অরণ্যকে দেখি, দেখি একটা প্রায়-বিস্মৃত সহজ কাহিনিকে, যেখানে উদ্ভিদের নিঃশব্দ নিভৃত চলনের সঙ্গে মিলে যায় মানুষের চলাচলও। এইরকম একটা সংহত জীবনের যে-ছবি এঁকেছেন শিল্পী, তার মধ্যে কিন্তু কোনও অতীতচারিতার বেদনা নেই, বরং যা রয়েছে তাকে লোকশিল্পের স্বভাবগত জীবন-উচ্ছ্বাস বলেই চিহ্নিত করা সম্ভব। বরং লক্ষ করতে হয়, এই প্রকৃতি-নির্ভরতা কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক অগ্রগতির প্রতি বিমুখ নয়। একটি ছবিতে যেমন দেখতে পাই পাখিতে পাখিতে ভরা একটা সমৃদ্ধ গাছ, আর তার নীচে দু'টি মানুষ— একজন এক হাতে ধরে রয়েছে একটি লম্বা সাঁড়াশি, অন্যহাতে কুঠার! এ কি শুধুই যন্ত্র-সভ্যতার প্রতীক, না কি এগুলি প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র, গাছটি কেটে ফেলার প্রস্তুতির অংশ? অন্যপাশে লাঠি-হাতে যে সতর্ক মানুষটি, সে কি পাহারা দিচ্ছে গাছটিকে, নাকি সেও এই ধ্বংসলীলার রক্ষক? এই দৃশ্যকল্পন তৈরি করে দেয় একাধিক, বহুরৈখিক ভাষ্য, তবু শেষমেশ পুরোটা একটা অসম ক্ষমতায়নের গল্প হয়ে দাঁড়ায়; গাছের আকার ও বিস্তৃতির তুলনায় মানুষেরা এতটাই ক্ষুদ্র ও অক্ষম যে, তাদের যাবতীয় বিনাশ-প্রচেষ্টা চেহারা নেয় একটা নিরর্থক বালখিল্যতার। যুগপৎ কারুণ্য ও ক্ষমার একটা ধারণাসূত্র এই চিত্রিত গাছটিকে যুক্ত করে দেয় প্রকৃতির সহনশীলতার সঙ্গেও।

শরীরের মধ্যে শরীর, তারও মধ্যে জেগে আছে অন্য অবয়ব— প্রায়-স্বচ্ছ রঙের ব্যবহারে এই নিবিড় সহাবস্থানের প্রতীক শিল্পীর একাধিক ছবিতে দেখতে পাই। মনে হয়, এগুলি যেন প্রকৃতপক্ষে এক-একটা অভিজ্ঞতার স্তর, যা পৃথক, অথচ জীবনের সূত্রে এতটাই পরস্পরসন্নিহিত যে, তার মধ্যে ধরা থাকে যাপনের সমগ্রতা, ঠিক একটা প্যালিম্পসেস্টের মতো। প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় ছবি 'বন আউর হাথি'— এতে উজ্জ্বল লাল রঙের পশ্চাৎপটে শিল্পী এঁকেছেন এক বৃহৎ হাতির অনচ্ছ শরীর। তার ওপরেই চিত্রিত হয়েছে বিভিন্ন জীবজন্তুর অবয়ব, এবং শেষতম স্তরে, পুরো ছবিটির ওপর, এক আশ্চর্য ছন্দে ডালপালা ছড়িয়েছে বৃক্ষকুল। গোন্ড পুরাকথায় হাতি অরণ্যের রক্ষক, ফলে সে পূজ্যও, এবং অন্য অরণ্যচারীদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। মানুষের বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে এখানে— ইঙ্গিত এইরকম যে, মানুষ বিপর্যয়কারী নয়, সে এই সহজ জীবনচক্রের অংশই বরং। বাঘও পূজ্য এঁদের, পশুখাদ্য সংগ্রহ বা শিকারের জন্য জঙ্গলে ঢোকার আগে 'বাঘ বনদেবী'কে আরাধনা করার প্রথা রয়েছে। এখানে আমাদের সহজেই মনে পড়ে যায় সুন্দরবনের দক্ষিণরায় ও বনবিবির আখ্যান, যদিও বঙ্গের বনবিবি ব্যাঘ্ররূপী নন, বরং তিনি ব্যাঘ্রারূঢ়া। শিল্পীর একাধিক ছবিতে বাঘ জড়িয়ে আছে গাছকে, এবং তা শুধু রক্ষাকর্তার বরাভয় নিয়ে নয়— বরং তার ভঙ্গির মধ্যে একটা

'সাত দূত'

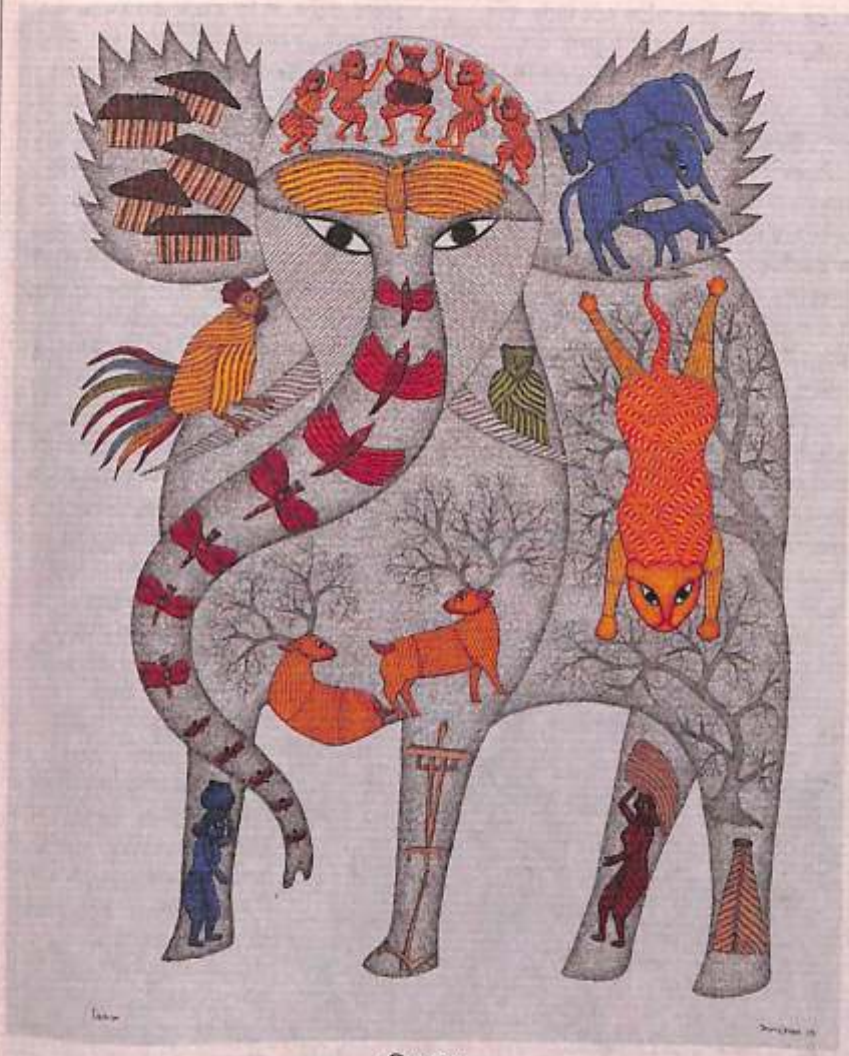

'রিওয়াজ'

আশ্চর্য মায়া লক্ষ করা যায়।

আসলে এই মায়ার কথাই বলে প্রত্যেকটি ছবি। অরণ্যাশ্রয়ী গ্রাম থেকে শহরের গ্যালারি, এই চিত্রকথনের যাত্রাপথ নেহাত কম নয়, এই দূরপরিসর অনেক অর্থকেই পরিবর্তিত করে দিতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা অব্যর্থভাবে জেগে থাকে তা হল একটা কেন্দ্রীয় প্রাণবিন্দুর বোধ, যা স্পন্দিত এবং আনন্দময়। লোকশিল্পের আরও একটি গহন যাত্রাপথ আছে, ঐতিহ্য থেকে সমকালীনতার বলয়ে নিজেকে প্রোথিত করার চলন সেটি। ভাজ্জু শ্যামের ছবির মধ্যে সেই রাস্তাকে পরিষ্কার চিনতে পারা যায়— একবার তিনি বিমানবন্দরকে এঁকেছিলেন এক ক্ষুধার্ত পাখির রূপে! ছবির রং বা মাধ্যমের দিক থেকে দেখতে গেলে, ঐতিহ্যগত ভাবে এইসব লোকশিল্প আঁকা হত প্রাকৃতিক রং দিয়ে— কয়লা দিয়ে তৈরি হত কালো রং, গেরিমাটি দিয়ে লাল, নর্মদা নদীর তীরের মাটি দিয়ে বানানো হত হলুদ। কিন্তু ভাজ্জু শ্যাম ব্যবহার করেছেন অ্যাক্রিলিক, কখনও কখনও কালি-তুলিও। খড়-মাটি ও গোবর লেপে দেয়ালে ছবি না এঁকে তিনি ছবি আঁকেন ক্যানভাসে। ফলে প্রকরণের দিক থেকে তিনি আধুনিক শিল্পচর্যারই পথিক। গোন্ড শিল্পের বিশিষ্টতা চিহ্নিত করে তাকে বিশ্বের কাছে প্রথম পরিচিত করেন জগদীশ স্বামীনাথন, আজ তা স্বমহিমায় খ্যাত। ফলে এই শিল্পধারার মধ্যে একটা পরিশীলন আসা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু এতে ছবির মূল মেজাজটি বদলায় না। প্রকৃতির আশ্রয়ই যে অমোঘ ও অদ্বিতীয়, সেই সত্য সমকালের মর্মে এসে লাগে একটা খুব সরল ও নির্বিরোধী প্রক্রিয়ায়। এই মর্মভেদ বড়ই প্রয়োজন এখন।

অনুরাধা ঘোষ

◆◆◆